১

উদ্ভট ছড়া অথবা অতুলনীয় লিমেরিক যাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছে বিশ্বখ্যাতির সোনার হার, আর যাঁর আসল স্বপ্ন ছিল ছবি-আঁকিয়ে হওয়ার, আর সেই সুবাদে একটা স্কেচের খাতা ছিল যাঁর বিশ্বভ্রমণের নিত্যসঙ্গী, সেই এডওয়ার্ড লিয়র ভারতবর্ষে এসে, তাজমহল দেখে একদম মজে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

'এখন থেকে পৃথিবীর অধিবাসীদের ভাগ করা হোক দুটো শ্রেণীতে। একদল যারা তাজমহল দেখেছে, আর একদল যারা দেখেনি।'

এইরকম একটা মিষ্টি, মুচমুচে, রসালো মন্তব্যকে মনের মধ্যে লজেন্সের মতো চুষতে চুষতে একদিন যখন তাজমহল সংক্রান্ত একটা বৃহদাকার বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, তখনই, আমাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ চোখের সামনে এগিয়ে এল আলডুস হাক্সলির এমন একটি লেখা, যা লিয়রের মুগ্ধতার ঠিক বিপরীত।

তাজমহল ভালো লাগেনি হাক্সলির। তাজমহলের অমন সাদা হাসি, অমন যুবতী-যুবতী গড়ন, অমন ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি বিদ্ধ করতে পারেনি হাক্সলির বুদ্ধি-ঘেরা হৃদয়কে। কেন ভালো লাগেনি তা সবিস্তারে, প্রভূত উপমা-উদাহরণ সহযোগেই আলোচনা করেছেন হাক্সলি।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণটা হল—'Poverty of imagination'। পড়ার পর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল অসন্তোষের একটা কালো ভোমরা। পৃথিবী যার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে 'অত্যাশ্চর্য' বিশেষণের রাজমুকুট, তেমন বস্তুও যাঁর চোখে আলোর ফুলকি ফোটায় না, তিনি নিশ্চয়ই রূপ-কানা। হাঙ্গলির দিকে ছুড়ে মারার মতো কোনো জোরালো যুক্তির অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে না পেয়ে মনে মনে উচ্চারণ করলুম টলস্টয়ের সেই উক্তি, যা তিনি পেয়েছিলেন টের্টুলিয়ান-এর মারফত, আর যা আমাদের কানে এসে পৌঁছেছিল ম্যাক্সিম গোর্কি-র মারফত—'জ্ঞান শত্রু'।

এই পড়া-পড়ির বছর খানেক পরেই প্যারিস। চলেছি ল্যুভ্‌র্-এর প্রকাণ্ড করিডোর দিয়ে। চলেছি বিশ্বের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'মোনালিসা'-র দিকে। বুক হয়েছে নদী। ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। শরীর ধনুক। শিরায় শিরায় টান। অবশেষে সেই স্বপ্নের সামনে। কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস। কিছুক্ষণ অপলক। সে যেন এক সম্মোহন। আঃ, কী সৌভাগ্যবান আমি! এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই সৃষ্টির সামনে যার সৌন্দর্য কালজয়ী, পৃথিবী নামক গ্রহের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জুড়ে যার খ্যাতির কিংবদন্তি, যার রহস্যময় হাসির ধাঁধা আজও উত্তরহীন অথবা নতুন নতুন উত্তরের সমারোহে ক্রমাগতই জটিল, যার উৎপত্তি অথবা বিকাশের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা এখনও অফুরন্ত, যাকে নিজের হাতে নাগালে পাওয়ার জন্যে একবারও লোভী হয়ে ওঠেনি, এমন রাজা-রাজড়া একদিন বিশ্বে ছিল বিরল।

এত কথা, এত প্রশ্ন, এত আলোচনা এবং এত বিতর্ক আর কোনো ছবিকে ঘিরে ঢেউ হয়ে ওঠেনিও বুঝি। এমন কি কে এই মোনালিসা তা নিয়েও বিতর্ক। এটা কি সত্যিই ফ্রানচেস্‌কো দেল গিওকোণ্ডোর ২৬ বছরের স্ত্রী মোনালিসা বা গিওকোণ্ডোর প্রতিকৃতি? কেউ বলছেন—না, ওটা আসলে ডাচেস অব ফ্রানকাভিলা Costanza d'Avalos-এর প্রতিকৃতি। কেউ বলছেন—তাও না। ওটা আসলে এক অন্য মহিলার। আঁকা হয়েছিল ধনকুবের গুইলিয়ানো দ্য

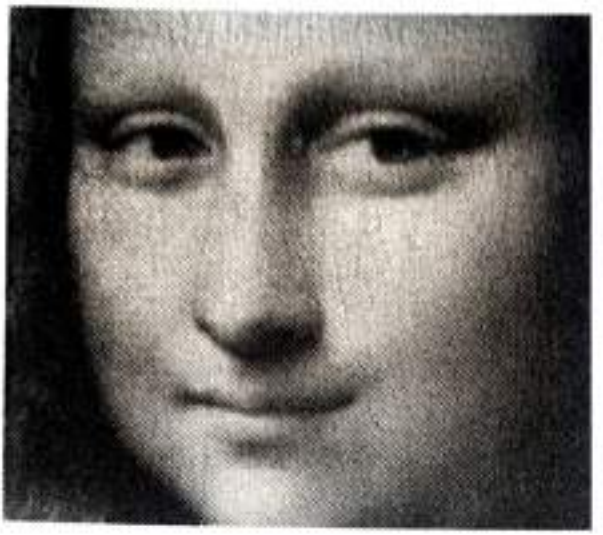

২

ফ্রানচেস্‌কো দেল গিওকোণ্ডো ফ্লোরেন্সের এক বিত্তবান নাগরিক। ব্যবসায়ী। গবাদি পশুর ব্যবসার ব্যাপারে নাকি বিশেষজ্ঞ। তা ছাড়া আছে জোতজমা। আগে বিয়ে করেছেন দুবার। দুবারই বিপত্নীক। মোনালিসা তাঁরই তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। মোনালিসা অবস্থাপন্ন বনেদি ঘরের মেয়ে। তবে ১৪৯৫-এ ফরাসি আক্রমণের পর ধস নামে অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যে। মোনালিসা সুন্দরী। বিয়ে করবে ঠিক করেছিল যাকে মনেপ্রাণে, সে বেচারি আচমকা হয়ে গেল যুদ্ধের বলি। বিত্তবান বিপত্নীককে প্রায় ধরে-বেঁধেই নিজের মেয়েটিকে গছিয়ে দিলে তার বাবা। গিওকোণ্ডোরও মনে হল, মন্দ কি, এমন একটি রূপসী তাঁর অপরিমিত বিত্তের সংসারে যদি হীরে-চুনি-পান্না বসানো গয়না কিংবা নিখুঁত কারুকাজ করা কোনো আসবাবের মতো দর্শনীয় হয়ে ওঠে, সমাজে, বন্ধুমহলে খাতিরই বাড়বে বরং। বিয়ে হয়ে গেল ৩০ কিংবা ভিন্ন মতে ২৬ বছরের মোনালিসার সঙ্গে ৪২ বছরের গিওকোণ্ডোর।

"But the charm of Monnalisa was to him less comprehensible than the merit of a new breed of Sicilian bullock, or the benefit of custom duties or undressed sheep-skins." রুশ লেখক দিমিত্রি

মেরেজকাউস্কি অন্য জীবনী-উপন্যাস 'দ্য রোমান্স অব লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি' থেকে এই উদ্ধৃতি। এ-রচনায় আরও বহুবার শরণাপন্ন হতে হবে তাঁর। যেহেতু রচয়িতা একজন কবি, তাই বইটিতে শুধু জীবন-কাহিনী নেই তারই সঙ্গে জুড়ে রয়েছে জীবনের রূপ-রঙ, বর্ণ-গন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস। মোনালিসা সম্বন্ধে ফ্লোরেন্সের নানা মহলে নানা গুজব। আর গুজব রটিয়ে, পরনারীর কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিতে মাথা গলিয়ে আমোদ পায় না, এমন লোক ফ্লোরেন্সে দুর্লভ। মোনালিসার প্রণয়ী ছিল নাকি অনেক। অনেক পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চেয়েছে তার আগুনে। কিন্তু এসব সত্যি-মিথ্যের বাইরে বিয়ের পরে যে মোনালিসাকে সবাই দেখল, সে শান্ত, গম্ভীর, দয়াবতী, ধর্মে-কর্মে আগ্রহী, এবং সর্বোপরি নিপুণ গৃহিণী। আর সবচেয়ে আশ্চর্য করল যেটা সবাইকে, তা হল সতীন-কন্যা ডায়োনারার উপর তার উথলোনো ভালোবাসা। ইতালি জুড়ে তখন নামডাক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির। ফ্লোরেন্সের গর্ব। নিজের বিখ্যাত কীর্তি 'লাস্ট সাপার' দেয়াল-চিত্রের পর এখন আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আরেক দেয়াল চিত্রে। আঁকা হচ্ছে ফ্লোরেন্সের গ্রান্ড কাউন্সিলের চেম্বারের দেয়ালে। বিষয়, অ্যানঘিয়ারির যুদ্ধ। তাঁর স্টুডিয়োয় তখন রাজা-রাজড়া, মহামান্য-গণ্যমান্যদের ভিড়। যদি রাজি হন একটা প্রতিকৃতি এঁকে দিতে। রাজমহিষীদের স্বপ্ন, যদি একটু সুযোগ ঘটে তাঁর ইজেলের সামনে বসার। আবেদন-নিবেদন অন্তহীন। লিওনার্দো নিস্পৃহ। যেন কান নেই শোনার, চোখ নেই দেখার। এই রকম একটা সময়েই লিওনার্দোর স্টুডিওয় হাজির হলেন গিওকোণ্ডো। যা সম্মান-দক্ষিণা লাগে দেব, আমার স্ত্রীর একটা প্রতিকৃতি এঁকে দিন। আপনি হ্যাঁ বললে ধন্য হই। মোনালিসার বেলায় সাড়া মিলে গেল এক ডাকে। তার কারণ কি মোনালিসার রূপ? সে-মুখে এমন কোনো অতীন্দ্রিয় লাবণ্যের ছাপ, যা আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি লিওনার্দোর, আর যা খুঁজে চলেছিলেন তিনি বহুদিন?

যে বাড়িতে জন্মেছিলেন লিওনার্দো

মোনালিসার ছবির সর্বাঙ্গ জুড়ে রহস্য। ১৫০২-থেকে তার শুরু। ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে তিন-তিনটে বছর। এখনো চলেছে আঁকা। মাঝে মাঝেই লিওনার্দোকে চলে যেতে হয় এদিক-ওদিক। তাই এত দেরি।

১৫০৫। শেষ হতে চলেছে বসন্তকাল। সেই সময়ের শান্ত, উষ্ণ একটা দিন। আকাশে মেঘের জমজমাট মজলিশ। তারই ফাঁকফোঁকর থেকে মাঝে মাঝে ঠিকরে বেরিয়ে আসে সূর্যের আলো। যেন সেই মস্ত মজলিসেরই হালকা হাসি। বাকি সময়টা আকাশ আর পৃথিবী যেন একটা মেঘ-ছায়ার ওড়না দিয়ে মোড়া। এই স্বচ্ছ মোলায়েম হালকা আলো আর এই কুয়াশা-ধূসর ছায়ার পরিবেশ লিওনার্দোর কাছে পরমপ্রিয়। প্রতিকৃতি আঁকার পক্ষে, বিশেষ করে সে প্রতিকৃতি যদি হয় রমণীর, এটাই হল আদর্শ ও রমণীয় সময়। প্রতিদিন এই সময়েই মোনালিসা আসে তাঁর স্টুডিও-য় সিটিং দিতে। মোনালিসা যাতে স্বাচ্ছন্দ্য পায়, মোনালিসার যাতে মনে না হয় যে এই বসে থাকা বড় বিরক্তিকর, তার জন্যে হাজারো রকম ব্যবস্থা। স্টুডিওর সামনেই লিওনার্দো বানিয়েছেন একটা ফোয়ারা, যা সর্বক্ষণ

আত্মপ্রতিকৃতি

তাঁর প্রিয় সখা পিকাশোর দিকে। পিকাশোর জীবনে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চেহারাটা কী রকম সেটা দেখে নিতে। আর তার জন্যে আবার চোখ পাতব পিকাশোপ্রিয়া ফেরনাঁদ অলিভিয়েরের স্মৃতিকথায়।

'প্যারিস-জার্নাল'-এ স্ট্যাচুয়েট-দুটো দিয়ে আসার পরের দিন সকালেই অ্যাপলিনের-এর ঘুম ভাঙল পুলিশের ডাকে।... এসব ব্যাপারে কেউই আমাদের জানায়নি। আমরা তার কোনো খবর পাইনি। খবর নিতেও সাহস পাইনি। হঠাৎ একদিন ঝমঝমিয়ে বেজে উঠল পিকাশোর দরজার ঘণ্টা।... আমি ছুটে গেলাম দরজাটা খুলতে। সাদা পোশাকের পুলিশ। আমাকে দেখাল তার আইডেনটিটি কার্ড। আর পিকাশোকে জানাল যে আজ সকাল নটায় তাকে হাজির হতে হবে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। কাঁপতে কাঁপতে পিকাশো বদলাতে লাগল তার